জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১

শওকত আলীর গল্প : মহাজন ও নিম্নবর্গের দ্বান্দ্বিকতার স্বরূপ

শিল্পী খানম*

Abstract

Shawkat Ali is a powerful writer in Bengali fiction. He is the most renowned writer of short stories and fiction. He is a socially conscious writer. He has relentlessly practiced literature since he became a teacher. In the sixties, he emerged as a short story writer with distinct mindset, choosing rural life and the countryside in the background of the story. In an agrarian society, landowners are moneylenders. The marginal class under them is the dominant group. This subaltern is oppressed, humiliated and exploited by landlords. They then protested, resulting in a conflict with the moneylenders. The story depicts how the lowerclass in Rangpur-Dinajpur region of North Bengal protested and resisted the exploitation of the moneylenders. The article tries to expose the nature of the conflict between the moneylenders and the subaltern.

শওকত আলী (১৯৩৬–২০১৮) ষাটের দশকের ছোটগল্পকার। এ দশকের বেশির ভাগ গল্পকারের প্রবণতা যেখানে নাগরিক মধ্যবিত্ত মানসের দ্বন্দ্বময় টানাপোড়েন, তাদের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ব্যর্থতাজনিত বিষাদ ও মনোজটিলতা উন্মোচন, সেখানে তিনি নিমগ্ন ছিলেন গ্রামীণ সমাজের অভ্যন্তরে মহাজনের শোষণ, বঞ্চনা, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত নিম্নবর্গের মানবেতর জীবন ও তাদের ইন্দ্রিয়জ নানা সমস্যা উপস্থাপনে। শওকত আলী তৎকালীন পশ্চিম বাংলায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর তাঁর পরিবার উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন। এছাড়া কলেজ-শিক্ষক শওকত আলী কর্মসূত্রে ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর অঞ্চলে বেশ কিছুদিন অবস্থান করার কারণে খুব কাছ থেকে দরিদ্র কৃষিজীবীদের অবলোকন করার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে উত্তরবঙ্গের জনজীবন তাঁর লেখা উপন্যাস ও গল্পে একটি বিশেষ স্থান পায়। 'উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল টান। তাঁর সাহিত্য জীবনের পুরোটা সময় রাজধানী ঢাকায় বসবাস করলেও তাই দেখা গেছে

উত্তরবঙ্গের জনজীবনই তাঁর লেখার উপজীব্য বিষয়।'[১] বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে মহাজন-জোতদারের শোষণ-বঞ্চনা নিয়ে আরও যাঁরা গল্প লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবু ইসহাক (১৯২২-২০০৩), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) ও হাসান আজিজুল হক (জন্ম : ১৯৩৯) প্রমুখ। এঁদের গল্পে গ্রামীণ জীবনকাঠামো ও নিম্নবর্গের সঙ্গে মহাজনের দ্বন্দ্বের স্বরূপও উন্মোচিত হয়েছে। কৃষি পেশার সঙ্গে যুক্ত দরিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণির কৃষক, আধিয়ার, বর্গাচাষী, ভাগচাষী, দিনমজুর, কামলা, বাঁধাচাকর এদের জীবনবৃত্ত ঘিরে আছে মহাজন-জোতদার। নিম্নবর্গকে শোষণ করেই তাদের প্রতিষ্ঠা। মহাজনেরা ক্ষমতা ও অর্থের দাপটে নিম্নবর্গের ভিটে-মাটি, জীবন-জীবিকা, কন্যা, স্ত্রী কেড়ে নিয়ে তাদের নিঃস্ব করে। ফলে নিম্নবর্গও সুযোগ বুঝে মহাজনের জীবন ও সম্পদের ওপর নির্মমভাবে

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আঘাত করতে দ্বিধা করে না। 'শত্রুতার রূপরেখা শওকত আলীর গল্পে স্পষ্ট– আধিয়ার-দিনমজুর বনাম চৌধুরী-মহাজন।'[২]

শওকত আলীর গল্পে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র ফুটে উঠেছে। আধিপত্যবাদী মহাজন ও তার অধীনে বসবাসরত নিম্নবর্গের অধীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই প্রবন্ধে নিম্নবর্গ ও মহাজনের সম্পর্কসূত্র খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। 'মহাজন' সংস্কৃত শব্দ, যার আক্ষরিক অর্থ মহৎ মানুষ। তবে প্রায়োগিক অর্থে এর মানে হচ্ছে বণিক, ডিলার বা দোকানদার, ব্যাংকার, পোদ্দার প্রভৃতি। বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে 'মহাজন' শব্দের একটি আপেক্ষিক অর্থ রয়েছে। মূলত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে ব্যক্তি অধস্তনের ভূমিকা পালন করে, তার পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদন প্রকরণ ও বিতরণের মালিক হলেন মহাজন। তবে গ্রাম বাংলার সব ধরনের পাওনাদারকে মহাজন বলা হয়। ব্রিটিশ আমল থেকেই গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতিতে মহাজন শ্রেণির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় বাংলার কৃষকসমাজ মহাজনের হাতে সম্পূর্ণ বন্দি হয়ে পড়ে। এরপর ব্রিটিশ সরকার ঋণ সালিশি বোর্ড স্থাপন করে ঋণগ্রস্ত কৃষককুলের বোঝা লাঘবের চেষ্টা করেন। দেশবিভাগের পর এদেশের সমাজ ও অর্থনীতিতে মহাজনী প্রথার প্রভাব কমতে থাকে। তবে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে অভাব ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মহাজন শ্রেণি নিজেদের ভোগবাদী মানসিকতা চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। ফলে অনিবার্যভাবে মহাজন ও নিম্নবর্গের বিরোধের সূত্রপাত হয়। এই প্রেক্ষাপটে লেখা শওকত আলীর অনেক গল্প সাবঅল্টার্ন বা নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় হতে পারে অন্যতম অনুষঙ্গ। সাবঅল্টার্ন বা নিম্নবর্গ – এই ধারণাটি সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ গোষ্ঠীর লেখকেরা মার্কসবাদের অন্যতম প্রবক্তা আন্তোনিও গ্রামশির *'Selections from the Presion Notebooks'* (১৯৪৭) গ্রন্থ থেকে পেয়েছেন। ইতালীয় 'সুবলতেনো' শব্দ থেকে ইংরেজি সাবঅল্টার্ন শব্দটি এসেছে। ইংরেজি ভাষায় যার আভিধানিক অর্থ ক্যাপ্টেনের অধস্তন কর্মকর্তা। ভারতবর্ষে Subaltern Studies গোষ্ঠীর প্রধান তাত্ত্বিক রণজিৎ গুহ। তিনিই সর্বপ্রথম 'নিম্নবর্গ' শব্দটি ইংরেজি ঝঁনধষঃবৎহ শব্দের প্রতিরূপ হিসেবে বাংলায় গ্রহণ করেন। এই গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে অন্যতম হলেন – গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রি চক্রবর্তী প্রমুখ। রণজিৎ গুহ তাঁর *Subaltern Studies* গ্রন্থে যাদের নিম্নবর্গ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁরা হলেন – গরিব চাষী, প্রায় গরিব ও মাঝারি চাষী, নির্বিত্ত ভূমিহীন, হীনবল গ্রামভদ্র, সম্পন্ন মাঝারি কৃষক ও ধনী কৃষক, গরিব শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত, গ্রাম ও শহরের গরিব জনতা, আদিবাসী, নিম্নবর্গ, এমনকি নারীরাও নিম্নবর্গের অধিভুক্ত।

কথাসাহিত্যিক শওকত আলী মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতেন। ফলে মার্কসবাদী চিন্তাচেতনার প্রভাব তাঁর সাহিত্যে স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা চারটি– *উন্মূল বাসনা* (১৯৬৮), *লেলিহান সাধ* (১৯৭৮), *শুন হে লখিন্দর* (১৯৮৮), *বাবা আপনে যান* (১৯৯৪)। তাঁর *লেলিহান সাধ* ও *শুন হে লখিন্দর*– এ দুটি গল্পগ্রন্থে লেখকের নির্দিষ্ট একটি জীবন জিজ্ঞাসার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে – তাহলো মার্কসীয় শ্রেণিদ্বন্দ্ব। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগই গ্রামীণ মহাজনের অধীনে ও নিয়ন্ত্রণে থাকে। মহাজনের ভূমিতে কৃষি কাজ করে তারা জীবিকা-নির্বাহ করে। কৃষিজীবী শ্রেণির জীবনকাঠামো একটি বৃত্তে আবদ্ধ, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেই তাদের বাঁচতে হয়। তার সঙ্গে আছে মহাজনের শোষণ, নিপীড়ন। গ্রামের বিত্তহীন মানুষের জীবনের যন্ত্রণা, রোগ-শোক,স্বার্থপরতা, লোভ, ক্রোধ, জৈবিকতা প্রভৃতি তাঁর গল্পে শিল্পরূপ লাভ করেছে। একই ভাবে মহাজনশ্রেণির স্বার্থপরতা ও লোলুপতার চিত্রও লেখক

ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রামীণ সমাজের বহুমাত্রিক দ্বন্দ্বের স্বরূপ তাঁর রচিত *লেলিহান সাধ* ও *শুন হে লখিন্দর* গ্রন্থে একটি ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। গ্রামের কৃষিনির্ভর জীবনব্যবস্থায় ভূমির মালিক মহাজন ও তাদের অধীনস্থ নিম্নবর্গের সমস্যা, সংকট ও সংগ্রাম তাঁর গল্পে চিহ্নিত হয়েছে। সমাজে উৎপাদন কাঠামোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে মহাজন এবং তাদের অধীনস্থ দরিদ্র জনগোষ্ঠী। মহাজন অর্থ ও ভূমি-সম্পদের মালিক, এ সূত্রে তারা শোষক, উৎপীড়ক, ক্ষমতাবান ও মর্যাদাবান। অন্যদিকে নিম্নবর্গ দরিদ্র, ভূমিহীন; নিম্নবর্গের শ্রমজীবীরা সমাজে মর্যাদাশূন্য। মহাজন ও নিম্নবর্গের দ্বন্দ্বের পটভূমিতে রচিত গল্পসমূহকে বিষয়বস্তুর আলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন:

(ক) মহাজন কর্তৃক আধিয়ার শোষণ ও নিম্নবর্গের প্রতিরোধ বাসনা নিয়ে লেখা গল্প : 'নবজাতক'
(খ) মহাজনের বিলাসীজীবন ও বেকার কৃষকদের ক্ষোভ নিয়ে রচিত গল্প : 'আর মা কান্দে না'
(গ) মহাজনের স্বার্থপরতা ও দারিদ্র্যপীড়িত রোগগ্রস্ত প্রজাদের হাহাকার নিয়ে রচিত গল্প : 'ভবনদী' ও 'অচেনা'
(ঘ) মহাজন-জোতদারের বিরুদ্ধে সর্বহারাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের গল্প : 'লেলিহান সাধ', 'নয়নতারা কোথায় রে', 'সোজারাস্তা' ও 'দুই গজুয়া'
(ঙ) মহাজন কর্তৃক নারী-নির্যাতন ও নারীর প্রতিশোধের গল্প : 'অন্ধকারের গান', 'বিদায় দে মা' ও 'ডাকিনী'
(চ) মহাজনের শোষণের বিরুদ্ধে আদিবাসী নিম্নবর্গের দ্রোহের আখ্যান : 'কপিলদাস মুর্মূর শেষ কাজ' ও 'শুন হে লখিন্দর'

(ক) মহাজন কর্তৃক আধিয়ার শোষণ ও নিম্নবর্গের প্রতিরোধ বাসনা

শওকত আলীর 'নবজাতক' গল্পে গ্রামীণ জীবন ধারায় চিরায়ত মহাজনী প্রথার শিকার আধিয়ার কৃষকের বঞ্চনা-লাঞ্ছনা আর নির্যাতনের কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। গল্পে মহাজন ও তাদের অধীনস্থ প্রান্তিক কৃষক শ্রেণির দ্বান্দ্বিকতার স্বরূপ ফুটে উঠেছে। উত্তরবঙ্গের মঙ্গা পীড়িত কৃষকেরা যখন খাদ্য সংকটে পড়ে তখন নিরূপায় হয়ে মহাজনের দ্বারস্থ হয়। মহাজন এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে বর্গা চাষীদের চড়া মূল্যে ধান কর্জ দেয়। আবার ধানের মৌসুমে ঐ ধানের পূর্বের বাজার মূল্যে বর্তমানের সস্তায় ধান নিয়ে নেয় বহুগুণ। গল্পে বৃদ্ধ কৃষক হাসন আলীর পুত্র মন্তাজ আলী মহাজনের এই দুধারী কারবারের শিকার হয়। লেখক এই গল্পে আধিয়ার কৃষকদের শোষণের কৌশল উপস্থাপন করেছেন। মহাজনের ক্ষেতে ফলানো ধান নিশ্চিতভাবেই ঋণে তারই গোলায় মজুত হয়। আধিয়ার মন্তাজ খামার বাড়ীতে ধানমাড়াই শেষ হলে অর্ধেক ধান পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে, কারণ নিয়মানুযায়ী উৎপাদিত ধানের অর্ধেক জমির মালিক মহাজনের আর অর্ধেক আধিয়ারের। তবে পূর্বের ঋণের ধান শোধ করতে হবে সুদে-আসলে আর তারপরই আধিয়ারের প্রাপ্য ধানের ভাগ বাটোয়ারা হবে :

> ঐ লম্বা খেরো-বাঁধানো খাতাটাকে তার বড় ভয়। গুটি গুটি কালা আখরের হিসেবগুলো তার কাছে চিরকালই গোলমেলে। কী হিসেব যে দেখাবে মহাজনের ছেলে তা কারো বাপের সাধ্য নেই বোঝে। মনকে মন ধান মাড়াই হবে, কিন্তু দেখো, ঘরে ফেরার সময় একটা বস্তা পুরো নিয়ে যাওয়া যাবে না।[৩]

গ্রামের প্রান্তিক চাষীদের নিয়তি মহাজনের খেরো খাতায় বন্দি হয়ে পড়ে। শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হয় বর্গাচাষীরা। ধান মাড়াই শেষে মন্তাজ ছোট মহাজনকে প্রশ্ন করে : 'আচ্ছা মহাজন তাইলে হামার কর্জটা শোধ করিতে কয় মন ধান লাগিবে?' এরূপ প্রশ্নে মন্তাজকে ধমক খেতে হয় মহাজনপুত্রের; কারণ প্রবাদ আছে 'আধির আধা বখরা।' মন্তাজের মনে হয় ধানগুলো তার নিজের, কেননা জমিতে লাঙ্গল চালিয়ে কঠিন পরিশ্রম করে ঘাম ঝরিয়ে তবে ফসল ফলাতে হয়েছে: 'আহ্ সে বড় কষ্ট বাহে, ধানের কথা আর কহেন না। ধান বড় কষ্টের জিনিস। মন্তাজ আলী ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে কেমন স্বগতোক্তি করতে থাকে।' সারাবছর হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পর ফসল উঠলে ধার পরিশোধ করে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরতে মন্তাজ রাজি হয় না। তার ক্ষুব্ধ মনে হঠাৎ তেভাগা আন্দোলনের কথা মনে পড়ে আর তাইতো ছোট মহাজনকে আকস্মিকভাবে বলে ওঠে: 'তেভাগার কথা জানেন তুমরা? ঐ যে ধান কাটা নিয়ে গোলমাল, জানেন তুমরা? ঐ বছরও কি ধান কর্জের এই নিয়ম ছিল?' বর্গাচাষীর প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে মহাজন বলেছে: 'আচ্ছা মন্তাজ, তোর কি কুনোদিন হুঁশ জ্ঞান হবেনি–কুন পুরানা কালের কথা, উসব শুনে তোর কী লাভ কহ? উসব হাঙ্গামা হুজ্জতের কথা কি ভালো?' মন্তাজের ভেতরে ধ্বনিত হয় : 'আধির আধা ভাগ হামরা পাবো নাই?' এক পর্যায়ে নিজের প্রাপ্য ধান সে বস্তায় ভরতে থাকে। এমন সময় মহাজনের দুই লাঠিয়াল দ্বারা প্রহৃত হয়ে মন্তাজের স্মৃতিতে তোলপাড় করে বাপ-দাদার মুখে শোনা তেভাগার রক্তাক্ত লড়াইয়ের কথা। এক সময় ঐক্যবদ্ধ কৃষকেরা ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পেতে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল।। মন্তাজ নিজের মধ্যে কৃষক বিদ্রোহের অনুরণন শুনতে পায়; অত্যাচারী মহাজন শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বাসনা জাগ্রত হয় : 'যদি আমার শক্তি থাকত। তাহলে-হাঁ, তা হইলে কি আর মারিবা পারে।' শওকত আলীর 'নবজাতক' গল্পে মহাজন কর্তৃক চাষীদের শোষণের সঙ্গে আবু ইসহাকের 'জোঁক' গল্পের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু জোঁক গল্পে বর্গাচাষীরা সংঘশক্তিতে জেগে ওঠে, যা 'নবজাতক' গল্পে অনুপস্থিত। ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনে কৃষক সম্প্রদায়ের দ্রোহ আর ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ জমিদার, মহাজন, জোতদার শ্রেণির ভীতকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। শওকত আলী গল্পে পুনরায় বঞ্চিত শ্রেণির উত্থান ও সম্মিলিত প্রতিবাদের জাগরণী শক্তি প্রত্যাশা করেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> 'নবজাতক' গল্পের আখ্যান গড়ে উঠেছে ভূমিভিত্তিক সামন্ত শোষণের আবহমান পটভূমিকায়। এ গল্পে একটি গোবৎসের জন্মকালীন প্রতীক তার মধ্য দিয়ে বৈরী সমাজ শক্তির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের উত্থানকেই বিম্বিত করা হয়েছে। ভূমিহীন বর্গাচাষী হাসন আলী ও পুত্র মন্তাজের দারিদ্র্য ও ভূমিহীনতার যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সমগ্র তৃণমূল আশ্রয়ী খেটে খাওয়া নর নারীর চিরায়ত বঞ্চনার ইতিবৃত্ত বিম্বিত হয়েছে গল্পটিতে।[৪]

তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস শওকত আলীর কথাসাহিত্যে চিরায়ত সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে বারংবার এসেছে। ইতিহাসের এই রক্তাক্ত অধ্যায় ভূমিহীন আধিয়ার শ্রেণির উজ্জীবনের মূলতন্ত্র। ব্রিটিশ আমলে বাংলার শোষিত, নিপীড়িত কৃষক সম্প্রদায় জমিদার, জোতদার ও সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে যা তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯৪৬ সালে দিনাজপুর জেলায় এর সূত্রপাত হয়। তেভাগা আন্দোলনকারীদের স্লোগান ছিল 'আধি নয়, তেভাগা চাই, লাঙল যার জমি তার'। মূলত উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুভাগ কৃষকদের দাবী ছিল। ভূমিনির্ভর জীবন ও জীবিকার অভ্যন্তরীণ শোষণের প্রসঙ্গটি লেখক অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়:

শওকত আলী নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনালেখ্যের অসঙ্গতিকে পাশ কাটিয়ে গ্রামীণ জীবনের দারিদ্র্য-হাহাকার বঞ্চনা-নিঃস্বতাকে তাঁর গল্পে স্থান দেন পরম মমতায়। বস্তুবাদী সমাজচিন্তায় উজ্জীবিত শওকত আলী শ্রেণি সচেতনতার আলোকে নির্মাণ করেন সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের নির্মম শোষণের চিত্র, বঞ্চিত নিষ্পেষিত মানুষের হাহাকার, সংগ্রাম এবং ক্রম উত্তরণ।[৫]

(খ) মহাজনের বিলাসী জীবন ও বেকার কৃষকের ক্ষোভ

শওকত আলী রচিত 'আর মা কান্দে না' গল্পে গ্রামের হত দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক রমজান আলীর দুর্বিষহ জীবন-যন্ত্রণার ছবি যেমন আছে, তেমনি রয়েছে মহাজনের প্রাচুর্যময় বিলাসী দিন-যাপনের চিত্র। বর্ষা মৌসুমে ভূমিহীন কৃষকেরা বেকার হয়ে পড়ে। আধিয়ার কৃষকের পুত্র রমজানের নেই স্থায়ী উপার্জন, ভাঙা কুঁড়ে ঘরে ক্ষুধার্ত, রোগে কাতর বৃদ্ধ মাতার অবিরাম কান্না সহ্য করতে না পেরে জননীর মৃত্যু কামনা করে : 'তুই মরতে পারিস না বুড়ি। মর তুই মরে যা, আমি শান্তি পাই তাহলে।' সর্বহারা রমজানের জীবনে পিতার মৃত্যুর পর ভয়াবহ আর্থিক বিপর্যয় নেমে আসে; মহাজন আধির জমি ফিরিয়ে নেয়। এরপর মহাজনের ক্ষেতে দিন মজুরি করে জীবন ধারণ করে সে। বর্ষার অবিরাম বর্ষণে তার জীবিকা বন্ধ হয়ে যায়, তখন মহাজন কোন আর্থিক সহযোগিতা করেনা। তাইতো দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা রমজান মহাজনের স্বার্থপরতায় খেদোক্তি করেছে : 'বৃষ্টির জন্যে যে নিড়ানির কাজ বন্ধ আছে, আর কাজ বন্ধ থাকলে যে মহাজন পয়সা দেয় না- সে সব বিচার নেই।' গ্রামের নিম্নবর্গের মানুষ ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর রোগ-ব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে। অথচ গাঁয়ের চৌধুরী মহাজনরা বাদল দিনে তাদের বৈঠক খানায় মনোরঞ্জনের জন্য যৌন উত্তেজক জমজমাট গানের আসর বসিয়েছে। একটানা বর্ষণে উপার্জনহীন কামলারা তখন চৌধুরী বাড়ি ছুটে যায়। মহাজনের গানের আসরে উপস্থিত দিনমজুর রমজান ও লাল মোহাম্মদ উপলব্ধি করে মহাজনের উপভোগ্যময় জীবন। গল্পে নারীলিপ্সু মহাজন পিতা ও পুত্রের অবাধ যৌনাচারের চিত্র ফুটে উঠেছে : 'ছোট চৌধুরী ছকরা পোষে। বাপের নজর কলিমদ্দিন চোরের বউয়ের ওপর আর ছেলে অল্পবয়সী দুই ছোঁড়া বিনোদলাল আর শাজামালকে নিয়ে পাগল।' গল্পে একদিকে নিরন্ন সাধারণ মানুষের হাহাকার, আরেক দিকে মহাজন চৌধুরীদের আমোদ-প্রমোদ। বর্ষাকালে মহাজনের প্রতিবেশী লাল মোহাম্মদ তাকে কলিমদ্দি চোরের সাগরেদ হবার জন্য প্রস্তাব দেয়, চুরির স্থানও নির্ধারণ করে মহাজনের গোলা। গল্পের শেষে সর্বহারা শ্রেণির প্রতিবাদী চেতনাও ব্যক্ত হয়েছে। ধনবৈষম্যে তাদের ভেতরে ক্ষোভ জাগে, লাল মোহাম্মদ রমজানকে উদ্দেশ্য করে বলেছে : 'উদিক শালারা ধান জমা করিছে কত দ্যাখ। কেহ চৈত্রের খরার দিন আগুন লাগায় না ক্যানে?' এখানে প্রান্তিক কৃষক রমজানের কল্পনায়ও যেন ভেসে ওঠে মহাজনের আশুবিনাশ: 'কল্পনায় দেখতে পায় চৌধুরী বাড়ি পুড়ছে। আসমান লাল হয়ে উঠেছে। ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে। দাউ দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে সারি সারি ধানের গোলা।' এখানে মহাজন কর্তৃক শোষণের শিকার নিম্নবর্গের প্রতিশোধ নেবার বাসনা ব্যক্ত হয়েছে। ক্ষুধার আগুনে দগ্ধ প্রান্তিক মানুষগুলো তাই মহাজনের ধানের গোলায় আগুন দিতে চায়। 'রমজান আলীর মুমূর্ষু মায়ের নিরন্তর কান্নার পটভূমিকায় গল্পটি রচিত হলেও আসলে মৃত্তিকাস্পর্শী নর-নারীর দারিদ্র্য শোষণ ও নিঃশব্দ হাহাকারের কথা শব্দরূপ লাভ করেছে।'[৬] গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় বঞ্চনাপিষ্ট কৃষক সমাজ ধীরে ধীরে মহাজন শ্রেণির বিরুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। 'বিশেষত নিঃস্ব ভূমিহীন চাষীকুল তাদের ব্যক্তিক ও সামূহিক অস্তিত্ব রক্ষায় প্রতিনিয়ত অবতীর্ণ হয়েছে দ্বন্দ্বে। এ দ্বন্দ্ব জোতদার মহাজন শ্রেণিশাসিত সমাজশক্তির বিরুদ্ধে।'[৭]

(গ) মহাজনের স্বার্থপরতা ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট রোগগ্রস্ত প্রজাদের হাহাকার

শওকত আলী রচিত 'ভবনদী' গল্পে আধিয়ার কৃষাণের অভাব-অনটন ও মহাজনের প্রাচুর্যময় জীবনের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। গল্পে হত দরিদ্র উমরালি ও নসরুদ্দিনের পরিবারের রোগ-শোক, অভাব-দারিদ্র্য, দুঃখ-যন্ত্রণা ভারাক্রান্ত ছবি পাঠকের হৃদয়কে নাড়া দেয়। অপরদিকে মহাজনের প্রচুর বিত্ত-বৈভবের মাঝে সুখ-সমৃদ্ধিতে দিন যাপনে নেই কোন কষ্টের ছায়া। অসুস্থ পুত্রের চিকিৎসার জন্য ব্যথিত ব্যাকুল উমরালি মহাজনের কাছে ভিটেমাটির বিনিময়ে হলেও অর্থ সাহায্য কামনা করে। কিন্তু উমরালিকে কোন টাকা-কড়ি দিয়ে সহায়তা করেনা বরং এ সময় ধর্ম-সংক্রান্ত বয়ানের মাধ্যমে আখেরাত ও পরকাল সম্পর্কিত চিন্তায় মশগুল হয়। স্বার্থপর মহাজন কৌশলে সুভাষণের মাধ্যমে চাষীদের তুষ্ট করে নিজের অর্থ-সম্পদ রক্ষা করে। আর অর্থের পরিবর্তে উমরালির পুত্রের জন্য দোয়া লেখা এক টুকরা কাগজ হাতে ধরিয়ে দেয়। হাজি মহাজনের কাছে বীজ ধানের জন্য আর্জি জানায় আধিয়ার নসরুদ্দিন। হাজি কৌশলে তা এড়িয়ে যায় এবং বড় ছেলে শহর থেকে ফিরলে তবে কোন ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেয়। অথচ একই দাবী নিয়ে সেখানে হাজির হয় গ্রামের সম্পন্নগৃহস্থ রামদাস বর্মণ। এ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে রামদাসের প্রয়োজন মেটানোর জন্য দশ মন বীজধান দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয় গোমস্তাকে। এভাবে মহাজন বৈষম্যমূলক আচরণ করে। উমরালির সন্তান বাঁচানোর আর্তি বা নসরুদ্দিনের বীজ ধানের আকাঙ্ক্ষা হাজিকে স্পর্শ করেনা। আধিয়ার নসরুদ্দিনের দুচোখে হতাশা আর যন্ত্রণার ছবি ভেসে ওঠে। রোগ-শোকে জর্জরিত তাদের পরিবারের ছবি লেখক এভাবেই তুলে ধরেছেন :

> তার মেয়েটি রোগকাতর, স্ত্রীর কঙ্কালসার বুকে দুধ আসে না, স্তন দুটি যেন শুকনো কাঁঠাল পাতা; একটি গরুর খুরে পোকা কিলবিল করছে-হাটে ফিনাইল মেলে না; ঘরের খুঁটি দুটি নড়বড়ে, কখন যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে বলা যায় না।

মহাজন বাড়ি থেকে কোন সাহায্য না পেয়ে নসরুদ্দিন নদীর তীরে এসে দেখতে পায় হাজি মহাজনের বড় পুত্র সপরিবারে শহর থেকে গ্রামে এসেছে। নিজের পরিবারের হতশ্রী দশার বিপরীতে মহাজন পরিবারের জৌলুস তার অন্তরে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। এ সময় দিবোদাসের নৌকায় নদী পার হবার জন্য শহর থেকে আগত বড় মহাজনদের বহনকারী নৌকা স্রোতের টানে দুর্ঘটনায় পতিত হয়। তখন মাঝির সহকারী সুবলচন্দ্র সাঁতরে রশির একপ্রান্ত তীরে থাকা নসরুদ্দিনের হাতে ধরিয়ে দেয়। কিন্তু নসরুদ্দিনের মনোজগতে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, প্রকাশ্যে সে উদাসীন থাকে। সে হাত থেকে নৌকার রশিটি ছেড়ে দিলে নৌকাটি মাঝনদীতে ডুবে যায়। এ প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> দারিদ্র্যের এই শত ছিন্ন ছবি নসরুদ্দিনকে আরো ঠেলে দেয় জীবনের অর্থহীন উপলব্ধিতে এবং সেই অবশ করা ভাব অনিত্যতার এই অনুভূতি তীব্রভাবে তাকে উদাসীন করে তোলে। ফলে মাঝনদীর ঘূর্ণিতে চিরকালের মতো তলিয়ে যায় বড় মহাজনের নৌকা এবং এভাবেই প্রতিশোধের অগ্নিতে ভস্মীভূত হয় কায়েমি স্বার্থান্বেষীদের উদগ্র লোভ ও শক্তিমত্ততা।[৮]

স্বার্থপর মহাজন ও বঞ্চিত কৃষক এই দুই শ্রেণির জীবনের বাস্তবসত্য অঙ্কনে শওকত আলী পারঙ্গম শিল্পী। 'অচেনা' গল্পে মহাজন চৌধুরীদের অঢেল সম্পত্তি, প্রাচুর্যময় জীবন দেখে হত দরিদ্র দিনমজুর কিসমত আলীর ক্ষোভ গল্পের শুরুতে ফুটে উঠেছে। সে মহাজন বাড়িতে মজুরি বিক্রি করে জীবন ধারণ করে। মহাজনের স্বার্থপরতায় তার প্রতি ঘৃণা জাগে। কেননা দরিদ্রদের সে ন্যায্য

মজুরি দেয় না, নিজেদের প্রয়োজনে দিন মজুরদের শ্রম শুষে নেয়। তাইতো ক্ষোভে কিসমত মনে মনে গালমন্দ করে মহাজনকে : 'সে গাল দেয় মনে মনে, এক মন- ধান কর্জ চাইলে পাওয়া যায় না, ইদিক খালি ডাকাডাকি-শালা যাইস কাইল তুই, তোর মুখত যুদিন মুতে-না দু, তো মুই বাপের জন্মা না।'

'অচেনা' গল্পে মহাজনদের সীমাহীন লোভের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। ঋণের দায়ে জর্জরিত আধিয়ার কৃষাণদের ঘর-বাড়ি স্বল্পমূল্যে হাতিয়ে নেবার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় মহাজনেরা। উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ জীবনে মঙ্গা বা আকাল ছিল এক সময় নিত্যসঙ্গী। আকাল হলে মহাজনদের দখলে দরিদ্রদের ফসলি জমি, বসতভিটা সব চলে যায়। একদিকে তাদের সম্পদ বাড়ে, অপরদিকে নিম্নবর্গ সর্বহারা হয়ে পড়ে। লেখক অনেকটা সমাজতাত্ত্বিকের ন্যায় 'অচেনা' গল্পে মহাজনদের প্রাচুর্যের উৎস তুলে এনেছেন:

> একবার করে আকাল পড়ে আর শালা তোমাদের জমি বাড়ে। আকালের জন্যে মহাজনের জমি বাড়ে, নাকি মহাজনের জমি বাড়াবার জন্যে আকাল হয়- এও একটা তার কাছে দুর্বোধ্য সমস্যা। তার অনুমান মহাজনের জমি বাড়াবার জন্যেই আকাল হয়।

চৌধুরী বাড়ি চুরি করতে গিয়ে কিসমত জানতে পারে তার জমি হাতিয়ে নিতে চায় চৌধুরী পরিবার। তার শ্রমে উৎপাদিত ধান তাকে সাহায্য হিসেবেও দেওয়া হয় না। এ কারণে রাতের অন্ধকারে চুরি করতে বাধ্য হচ্ছে এবং অপরাধমূলক কাজকে ন্যায়সঙ্গত মনে করেছে : 'জমিতে চাষ করলাম আমি, ফসল ফলালাম আমি, সেই ফসল যদি আমি নিই তাহলে চোর হব কেন?' অবশ্য বিনা চিকিৎসায় স্ত্রীর মৃত্যু হলে এরপর অনাহারী সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দিতে দিশেহারা কিসমত ধান চুরি করে বস্তা পিঠে ফেলে সগৌরবে মহাজনের উঠান দিয়ে বেরিয়ে আসে। এ সময় বাড়ির কাজের লোক জয়গুন ও শুকুর মোহাম্মদ তাকে দেখে ফেললেও মহাজনের জিজ্ঞাসার জবাবে তারা অস্বীকার করে : 'আন্ধারত কি মানুষ চিনা যায়?' কিসমত, জয়গুন ও শুকুর মূলত একই শ্রেণির শোষিত নিম্নবর্গ। মহাজনের স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তারা। গল্পকার এখানে স্পষ্টতই দুটি শ্রেণির বিরোধ তুলে ধরেছেন। 'অচেনা গল্পটি এক প্রান্তিক ভূমিহীন চাষির বেঁচে থাকার লড়াই এবং তার অদম্য জীবন সংগ্রামের কথা। আবহমান গ্রাম এবং মহাজন বর্গাচাষির চিরন্তন দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে গল্পটি।'[৯]

(ঘ) মহাজন-জোতদারের বিরুদ্ধে সর্বহারাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ

শওকত আলীর গল্প নিম্নবর্গীয় মানুষের সচেতন প্রতিবাদ ও দ্রোহে জারিত। তাঁর 'লেলিহান সাধ' গল্পের পটভূমি মহাজনের প্রতি নিম্নবর্গের প্রত্যাঘাতের কথামালা। গল্পে মহাজনের শোষণ ও নির্যাতনের শিকার প্রান্তিক শ্রমিক মনোহর বর্মণ ও সবদর আলীর প্রতিবাদী চেতনা ব্যক্ত হয়েছে। মহাজনের জমিচাষ থেকে শুরু করে ধান গোলায় তোলা পর্যন্ত সব কাজ তারা করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি হল তারা মোট উৎপাদিত ধানের ষোল ভাগের একভাগ পাবে। অথচ স্বার্থপর মহাজন সেই প্রাপ্য মজুরি ধানও তাদের ঠিক মতো পরিশোধ করে না। 'লেলিহান সাধ' গল্পে মহাজন সালাম চৌধুরীর লোভী, স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর চেহারা উন্মোচিত হয়েছে। মহাজনেরা যে-কোন উপায়ে দিন মজুরদের শোষণ করে থাকে। এমন কি তাদের ন্যায্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত করে। ফসল চাষাবাদে উৎপাদন ও বণ্টনের নিয়ম চালু থাকলেও মহাজন পেশির জোরে তা মানে না। তারা দরিদ্রদের ঠকিয়ে থাকে, আর নিরুপায় অভাবীরা সেটা মেনে নিয়েই তাদের অধীনে কাজ

করে জীবিকা-নির্বাহ করে। মহাজন শ্রেণি শুধু ধনলিপ্সু নয়, তারা নারী লোলুপও। চৌধুরীর অবাধ যৌনাচারের চিত্রও চোখে পড়ে। ধনিক শ্রেণির ক্ষমতার উৎস অর্থ, এই অর্থের জোরে দরিদ্র কৃষকের কন্যা কিংবা স্ত্রীকে শয্যাসঙ্গী করতে পারেন : 'ক্ষেতের ধান বলো, ঘরের বউ বলো, আদরের মেয়ে বলো–সবকিছু গিলে খাবার জন্যে মহাজন মুখ মেলে বসে আছে।' প্রচণ্ড শীতের রাতে খোলা মাঠের মধ্যে ঝুপড়ি ঘরে মনোহর ও সবদর আলী মহাজনের ধানের মাড়াই পাহারা দেয়। অথচ মহাজন অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে সুখে নিদ্রা যাপন করে। লেখক সামন্ত শ্রেণির চারিত্র্যবৈশিষ্ট্যের স্বরূপ এভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন:

> কাসেমালির বউকে নিয়ে শুয়ে থাকে রাতভর, এখন আবার রহিমুদ্দিনের বিধবা মেয়েটাকেও বিছানায় শোয়াবার তাল খুঁজছে। ওদিকে আবার দেখতে না দেখতে দেনার দায়ে মহিন্দরের জমি হাতের মুঠোয় এনে ফেলল। তার সব আছে, তবু দ্যাখো, একে একে আসছে কেমন অঢেল। কিন্তুক হামার তানে কিছু দিবা চাহেনা। ভিখ নয়, মেহনতের দাম, দাও দিবা চাহেনা।

মহাজনের খামারে ধানের পাহারায় নিযুক্ত মনোহর ও সবদর আলী শীতের কবল থেকে বাঁচার জন্য মাঝরাতে মহাজনের বাড়িতে এসে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। ধানের পাহারা ফেলে চলে এসে মহাজনের সুখনিদ্রা ভঙ্গের কারণে সে ক্ষুব্ধ হয়। এরপর দুই দিনিয়ারকে গরুপিটা লাঠি দিয়ে নির্দয়ভাবে পিটাতে থাকে। মহাজন তাদের পিটিয়ে আহত করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্তে কাসেমালির বউকে নিয়ে শুয়ে পড়ে। রক্তাক্ত দুই দিনিয়ার তখনও আঙিনায় পড়ে আছে। মনোহরের তখন মনে পড়ে তার দাদা দীনবন্ধু বর্মণ এমন করেই মার খেয়েছে মহাজনের হাতে। তার বাবা খেয়েছে, এখন সে খাচ্ছে। সবদর আলীরও মনে হয় পুরুষানুক্রমেই তারা এভাবেই শোষিত-নির্যাতিত হয়েছে। মূলত 'মহাজনের হাতে কেবল সবদর বা মনোহর বর্মণই যে নির্যাতিত শোষিত হয়েছে এমনটি নয়, এই শোষণ ও নিপীড়ন পুরুষানুক্রমিক।'[১০] মহাজন সালাম চৌধুরীর হাতে নির্মম নির্যাতনের শিকার দুই দরিদ্র দিন মজুরের মধ্যে জেগে ওঠে ক্রোধের আগুন। শীতের রাতে উষ্ণতার জন্য আঙিনায় থাকা শুকনো খড়ে তারা আগুন জ্বালায়। সবদর আলী উঠে গিয়ে চৌধুরীর ঘরের বাহির থেকে শিকল তুলে দেয়। আগুনের লেলিহান শিখা মহাজনের বসত ঘরের চালা ছুঁয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ঘরে আটকা পড়া মহাজন ও কাসেমালির বউয়ের আর্তচিৎকার শুনতে পায় তারা। এভাবে অধিকারবঞ্চিত দুই শ্রমিক বদ্ধ ঘরে আগুন দিয়ে চৌধুরীকে হত্যা করে। নিরন্ন মানুষেরা তাদের উপর বংশ পরম্পরায় চলে আসা নিপীড়ন, নির্যাতনের চরম প্রতিশোধ নেয়: 'নয়ন ভরে দেখছে দাউ দাউ আগুনের লেলিহান শিখাগুলোকে। জন্ম-জন্মান্তরের সাধ, সারা জীবনের সবকিছু তখন চেখের সামনে জ্বলে উঠতে লাগল। আর মানুষ দুজন প্রাণভরে তাই দেখতে লাগল।'

গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় নিগৃহীত কৃষকেরা ধীরে ধীরে মহাজন শ্রেণির বিরুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। 'লেলিহান সাধ' গল্পে প্রান্তিক শ্রেণির সবদর ও মনোহর যেন গোটা সমাজের শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রে পরিণত হয়। ফলে গল্পে চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের প্রায় একই রকমের মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে । এ প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> শওকত আলীর ছোটগল্পে জীবন উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট আদর্শিক চেতনা ক্রিয়াশীল। গ্রামজীবনে সমগ্রতার রূপায়ণে শওকত আলী পৌনঃপুনিকভাবে প্রবেশ করেছেন আর্থ-সামাজিক শোষণ ও বৈষম্যের মূল উৎসে। গ্রামীণ জোতদার, মহাজন, ভূস্বামী ও সামন্ত প্রভুদের সংঘ

> শোষণের বিরুদ্ধে নির্জিত ছিন্নমূল মানুষের একক, কখনো বা যৌথ প্রতিবাদের শব্দরূপ হয়ে উঠেছে তাঁর গল্প।[১১]

মহাজন জোতদারের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিবাদের আরেক গল্প 'নয়নতারা কোথায় রে'। গ্রামের ভূমিহীন প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম সর্বোপরি তাদের বাঁচার লড়াই শওকত আলীর গল্পে ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে। এখানে জোতদার, মহাজন ভূ-স্বামী ও সামন্ত প্রভুদের শোষণ অত্যাচার-নির্যাতন আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিন্নমূল মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। রাতের অন্ধকারে মনোহর বর্মণের কন্যাকে মহাজনের পালিত সন্ত্রাসীরা জোর করে তুলে নিয়ে যায়। গ্রামের মহাজন শাজাহান চৌধুরীর আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা মাস্তানরা যে এই কৃষকের কন্যাকে অপহরণের সঙ্গে যুক্ত তাতে এলাকাবাসীর কোন সন্দেহ নেই। সংখ্যালঘু মনোহর ক্ষমতাবানদের কাছে অসহায়, তার চিৎকার যেন রাতের অন্ধকার ভেদ করে মানুষের দ্বারে গিয়ে আঘাত করে : 'জবাই করা জানোয়ারের মতো লোকটা কেবলি গড়াগড়ি খায়- মুই কি করমু দাদা, মোর নয়নতারাক ধরে লিয়ে গেল। মোর মা জননীক মারে ফালাবে মুই কি করমু।' এ ঘটনায় গ্রামবাসীরা একে একে ছুটে আসে। সমবেত জনতার মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। চৌধুরী মহাজনকে এর জন্য দায়ী করে মধ্যরাতে উত্তেজিত জনতা মহাজনের পথরোধ করে নয়নতারাকে উদ্ধারের জন্য দাবী জানায়। মহাজন এই ঘটনার সমাধান না করে বরং গ্রামবাসীর ভেতর দিয়ে গরুর-গাড়ি চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়। বিক্ষুব্ধ জনতা অনড় থেকে তাকে অবরোধ করেই রাখে। এ সময় মহাজনের ইঙ্গিতে তার সহকারী নেহাল বন্দুকের ট্রিগার টিপে ফাঁকা গুলি ছোঁড়লে ঐক্যবদ্ধ জনতা নেহালকে ধাওয়া করলে প্রাণভয়ে পালিয়ে যায় সে । জনতা এবার মহাজন শাজাহান চৌধুরীকে আক্রমণ করলে সেও প্রাণ বাঁচাতে পালাতে থাকে। এখানে প্রান্তিক মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে মহাজন পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। বার বার আঘাত খাওয়া নিম্নবর্গের মানুষ অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে ও মহাজন শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সমাজের নির্জীব মানুষগুলো এভাবেই প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে ওঠে। এ প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে উত্তীর্ণ বা অধিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটিও শওকত আলীর গল্পে মানুষ বিবেচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। একথা সত্য, প্রতিশোধের ব্যাপারে শওকত আলী খুবই আগ্রহী। এই প্রবণতাকে মানবিক অস্তিত্বের অংশরূপেই বিবেচনা করেন তিনি।[১২]

শওকত আলী রচিত 'সোজারাস্তা' গল্পে উত্তরবঙ্গের মঙ্গাপীড়িত অনাহারী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে উচ্চবিত্ত শ্রেণির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। গল্পের শুরুতে প্রত্যক্ষ করা যায়, আকালের কারণে দরিদ্র শ্রেণির অনেকে তাদের বসতভিটা বিক্রি করে জীবিকার তাগিদে গ্রাম ছাড়া হয়েছে। দিনমজুর শ্রেণির জন্য মঙ্গা এক মহাঅভিশাপ আকারে আবির্ভূত হয়। শুধু খাদ্যাভাবে নয়, বিনা চিকিৎসায়ও অনেকে প্রাণ হারায়। আকালে নাকাল হয়ে নিরুপায় পিতা যুবতী কন্যাকে খাদ্যের বিনিময়ে মহাজনের কাছে বন্ধক রাখতে চায়। এমন চরম দুর্দিনেও মহাজন শ্রেণির ধন ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। এরই মধ্যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় নতুন রাস্তা নির্মাণ শুরু হয়। গাঁয়ের উন্নয়নের জন্যে নয়া সড়ক তৈরি করার নামে ক্ষমতাবানরা এক কুটিল চক্রান্তে মেতে ওঠে। তোরাপ মিয়া, ধলুমণ্ডল, জামাল উদ্দিন মুন্সি, কানা চৌধুরী সোজা রাস্তার নামে এক জটিল ও বক্র রাস্তার মানচিত্র তৈরি করে। মূলত মহাজন শ্রেণি নিজেদের ঘরবাড়ি, জমির ওপর দিয়ে নয়, দিনমজুর ও সাধারণ ভূমিহীন শ্রেণির ভিটেমাটির উপর দিয়ে নতুনরাস্তা তৈরির গোপন পরিকল্পনা করে। রাস্তা তৈরি নিয়ে গ্রামের ক্ষমতাবান মহাজন শ্রেণির সঙ্গে হতদরিদ্র চাষি মজুরদের স্বার্থের

সংঘাত সৃষ্টি হয়। ভুখাদেরই শ্রমে তাদের সম্পদ বিনষ্ট করে, বসতভিটা নিশ্চিহ্ন করে রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় না। মূলত ভয়ানক এক ফাঁদে ফেলে ধনিক শ্রেণি নিজেদের ধানের গোলা, পাকা বাড়ি রক্ষায় এগিয়ে আসে। তাদের এই কারসাজি শ্রমজীবীরা বুঝতে পেরে একত্রিত হয়ে মহাজনদের ঘর-বাড়ির ওপর দিয়েই রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে কোদাল হাতে নিজেদের অবস্থানে অনঢ় থাকে। এখানে ঐক্যবদ্ধ মানুষের মধ্যে অনেকটা বিপ্লবাত্মক উত্তেজনা দেখা যায়:

> সরকার বাড়ির ধান-গোলার ওপর দিয়ে, মণ্ডল বাড়ির উঠোন কেটে, চৌধুরী বাড়ির পাকাভিটে ভেঙে সোজা চলে যাবে রাস্তাটা এইভাবে মাটি কাটলেই তো সোজা হবে রাস্তাটা। মানুষ ক'জনা সামনের দিকে দেখে নিয়ে নিশ্চিত হয়। তারপর আবার হাত লাগিয়ে সম্মিলিত কোদাল একসঙ্গে শূন্যে তোলে আর তখন, ঐ উত্তোলিত কোদালের ফলা ক্রুদ্ধ চৈত্রের রোদে ভয়ানক ঝকঝক করে ওঠে।

গ্রামের খেটে খাওয়া দিন মজুর শ্রেণির প্রতি মহাজনের বঞ্চনা ও অমানবিকতার চিত্র নিয়ে রচিত হয়েছে 'দুই গজুয়া'। মহাজন বাড়িতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে পোহাতু শেখ ও তার ভাগ্নে রহিমুদ্দিন। মহাজন তাদের ন্যায্য মজুরি দিতে কৃপণতা করে। মহাজনের গোলাভর্তি ধান থাকলেও বর্ষার আকালে অভাবীদের কোন সাহায্য মেলে না। অথচ এসব ক্ষেত মজুরাই সারাদিন পরিশ্রম করে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ফসল ফলিয়ে মহাজনের গোলায় ধান তুলে দিয়েছে। দরিদ্রদের মধ্যে যারা ভিটেমাটি বন্ধক দেয়, মহাজন তাদের ঋণ দিয়ে থাকে। ফলে ঋণ না পেয়ে মনোহরের মতো অনেকে গ্রাম ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কিন্তু নিরুপায় পোহাতু শেখ ও তার ভাগ্নে রহিমুদ্দিন বাঁধাচাকর হিসেবে মহাজনের সমস্ত কাজকর্ম করে থাকে। একদিন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতের মধ্যে ক্ষেতে নিড়ানির কাজে যায়নি। এমন দিনে দুজনে কিছুটা অলসতা করে খোশ গল্পে, হাসি আনন্দে খামারের গরুর দেখা-শুনার কথাও ভুলে যায়। অভুক্ত গরুগুলো বৃষ্টিতে ভিজে গেলে মহাজন তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। ক্রুদ্ধ মহাজন ক্ষিপ্ত হয়ে গালমন্দের সঙ্গে তাদের শারীরিক নির্যাতন করতেও দ্বিধা করে না। মহাজন হিংস্র পশুর মতো তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিরুপায় দুই নফর মহাজনের নির্যাতনের শিকার হয়েও তার অধীনে কাজ করে। তবে মহাজনের, নির্দয়তায় তারা ভেতরে ভেতরে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। মহাজনের অধীনস্থ হয়েও তারা আউশের ক্ষেত তার গরুর খাবারে পরিণত করে প্রতিশোধ নেয়।

শওকত আলীর গল্পেই শুধু নয়, তাঁর উপন্যাসেও মহাজনদের শোষণের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। তাঁর রচিত *প্রদোষে প্রাকৃতজন* (১৯৮৪), *নাঢ়াই* (২০০৩), *বসত* (২০০৫), *মাদারডাঙার কথা* (২০১১) প্রভৃতি উপন্যাসে উচ্চবিত্তের শোষণ, নিম্নবিত্তের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব ও নিম্নবর্গের সংগ্রামী জীবনের ছবি পাওয়া যায়। তাঁর সৃষ্টিতে আবহমান কাল থেকে সমাজের গভীরে বিরাজমান ধনী-দরিদ্র্যের বৈষম্য ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নানা চিত্র ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> গ্রাম জীবনের অভ্যন্তরে বহমান সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার চিরায়ত রূপটি ধরা পড়েছে তাঁর রচনায়। সামন্ত মহাজন ও ভূমিহীন বর্গাচাষীদের মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক শওকত আলী শ্রেণি বৈষম্যের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। অসম উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বৈষম্যমূলক বণ্টন পদ্ধতির দ্বারা কালপরম্পরায় শোষণ করা হয়েছে আবহমান বাংলার কৃষককুলকে। শওকত আলীর সাহিত্যে শোষণের এই নির্দয় রূপটি নানাভাবে বিধৃত হয়েছে।[১৩]

(ঙ) মহাজনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিশোধ

শওকত আলীর গল্পে নিম্নবর্গের নর-নারী সকলের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। মহাজনের শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে 'অন্ধকারের গান' গল্পে নুরবানুর জেগে ওঠার ভাষ্য শিল্পরূপ লাভ করেছে। মহাজনের বাড়িতে বংশ পরম্পরায় চাকর হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছে কসিমদ্দিনের বাবা-দাদা। কিন্তু কসিমদ্দিন এই গোলামি মেনে নেয় না; সে বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে স্বাধীনভাবে সুখে দিন যাপন করতে চেয়েছে। একদিন কসিমদ্দিনের সুন্দরী স্ত্রীর ওপর নজর পড়ে গাঁয়ের মাতব্বর মণ্ডল মহাজনের। নারীলিপ্সু মহাজন টাকার জোরে ষড়যন্ত্রমূলক চুরির মিথ্যা মামলায় কসিমদ্দিনকে জেল হাজতে প্রেরণ করে। এরপর নুরবানু মহাজনের খাসনফর লালমিয়া থেকে হাত বদল হয়ে মহাজনের যৌনদাসী হিসেবে আমোদশালায় বন্দি হয়। ঝলমলে পোশাক আর অলঙ্কারে আবৃত অসহায় নুরবানু লাঞ্ছনা আর গঞ্চনায় দিনাতিপাত করে। তিন বছর হাজতবাস শেষে কসিমদ্দিন বাড়ি ফিরে স্ত্রী নুরবানুকে ফিরে পেতে মহাজনের মুখোমুখি হয়; কিন্তু ক্ষমতাবান মহাজনের কাছ থেকে স্ত্রীকে উদ্ধার করতে পারে না। গ্রামছাড়ার হুমকি পেয়ে রাতের অন্ধকারে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কসিমদ্দিন তাকে নিয়ে পালিয়ে শহরে যেতে চায়, কিন্তু মহাজনের হাত থেকে রক্ষা নেই ভেবে নুরবানু অসম্মতি জানায়। তবে নুরবানুর ভেতরে জেগে ওঠে সাহসী আরেক নুরবানু। সে দিনের পর দিন খাটের নিচে লুকিয়ে রাখা ছুরি শানিয়ে তোলে: 'মুই দেখোঁ ছুরিখান, নুকায় নুকায় ইটা ঘষে আরো চখা কঁরো-ছুরিখান এখন মোর হাতের রূপার পটরির মতন ঝকঝক করে, কিন্তুক ছুরি মুই হাতত্ উঠাবা পারোঁনা-খুব ভারী।' মহাজন বাড়িতে নরকসম যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চায় নুরবানু। অবশেষে নারীলিপ্সু মহাজনকে সে একাই হত্যার করে স্বামীর হাত ধরে শহরের পথে এগিয়ে যায় :

> কিন্তু গলার স্বরটা অন্ধকারের মধ্যেই ক্রমাগত জেগে উঠতে থাকে। বহুদিনের বলা যায় বহুযুগের অন্ধকার ভেদ করে জেগে ওঠা গলার স্বরটা খিড়কির দরজার কাছে ঘুরপাক খায় আরো কিছুক্ষণ। তারপরই সেটা আগন্তুক একখানা ক্রোধের সঙ্গে হাতে হাত রেখে খিড়কির দরজা ছেড়ে সদরের দিকে এগিয়ে যায়।

সমাজের দুর্বল শ্রেণির ওপর সবল শ্রেণি সবসময় কর্তৃত্ব করে, অন্যায়-অবিচার করে, কিন্তু দুর্বলেরাও কখনও কখনও ঘুরে দাঁড়ায়। দিনমজুরের স্ত্রীকে জোরপূর্বক আটকে রেখে ধর্ষণের পরিণতি মহাজনকে ভোগ করতে হয়েছে জীবন দিয়ে। শওকত আলীর গল্পে নিম্নবর্গ ও মহাজন শ্রেণির এই দ্বন্দ্ব রূপায়ণ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> প্রত্যেকটি গল্পে শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের ক্রোধ প্রায়শ ব্যক্তিক হলেও সেটি আর ব্যক্তির থাকে না, সমষ্টির ক্রোধে রূপান্তরিত হয়। মহাজনের পরিকল্পিত নিষ্পেষণের শিকার অধীনস্থরা দ্রোহ করে। দ্রোহীরা যেহেতু মহাজনের একান্ত নিকটবর্তী থাকে, ভেতর বাইরের সকল খবর জানে, তাই তাদের আক্রমণের জন্য খুব বেশি প্রস্তুতির দরকার হয় না। তবে, প্রত্যেকটি গল্পেই শোষিতরা তাদের সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে লড়ে। তাদের জয়-পরাজয়ের দ্বিধা নেই। অসম্ভব শক্তি ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রবল প্রতাপশালী শ্রেণি শোষকের মুখোমুখি দাঁড়ায়।[১৪]

গ্রামের জোতদার-মহাজন শ্রেণির ব্যক্তিদের অর্থ ও নারীলিপ্সু চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য শওকত আলীর গল্পে ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে। 'বিদায় দে মা' গল্পে মহাজন বৃদ্ধ মহেব চৌধুরী নিম্নবিত্ত কৃষকের যুবতী কন্যা জোলেখার প্রতিহিংসার শিকার হয়। বয়োবৃদ্ধ চৌধুরী প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তার সদ্য

পরিণীতা জোলেখাকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হয়। গরুর গাড়ি গড়িয়ে টাঙ্গন নদীর জলে নিমজ্জিত হয়। এ সময় তীব্রস্রোতের কারণে জোলেখার শাড়িতে জড়িয়ে যায় মহাজন। জোলেখা নিজে বাঁচার চেষ্টা করে, অথচ ইচ্ছা করেই ডুবন্ত স্বামীকে রক্ষা করে না। এ সময় স্বার্থপর নিষ্ঠুর মহাজনের প্রতি তার ঘৃণার উদ্রেক ঘটে। সমাজে নিন্দিত এই মহাজন অর্থের বদৌলতে বৃদ্ধ বয়সেও যুবতী জোলেখাকে বিবি হিসেবে ঘরে তুলতে পারে। দরিদ্র অভিভাবকেরা অর্থের কাছে হার মানে। তাই বিপন্ন মহাজনের চিৎকারে তার কোন সহানুভূতি জাগে না। তখন তার পুরাতন স্মৃতি মনে নাড়া দেয়। ক্ষমতাবান মহাজনের নির্দয়তা মনে করে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠে। আকালের সময় অভাবীদের সঙ্গে মহাজনের নির্দয় আচরণ সে ভুলতে পারেনি। অভাবের দিনে দরিদ্ররা মহাজনের দয়া থেকে যেমন বঞ্চিত হয়, তেমনি ডুবন্ত মহাজনও স্ত্রী জোলেখার অনুকম্পা পায় না। মূলত বন্যাপরবর্তী আকালের সময় মহাজনের নিষ্ঠুর আচরণ মনে পড়ে, যা তাকে প্রতিশোধ পরায়ণ করে তোলে। তাইতো ডুবন্ত স্বামীর আর্তচিৎকারে ভ্রূক্ষেপ না করে সে মুক্তির আনন্দে স্রোতে আড়াআড়ি সাঁতার কেটে তীরে উঠে আসে আর টাঙ্গনের জলে ডুবে সলিলসমাধি ঘটে মহাজনের।

শওকত আলীর 'ডাকিনী' গল্পেও নারীর প্রতিশোধের চিত্র ফুটে উঠেছে। ক্ষুধার তাড়নায় গ্রাম থেকে মানুষ দলে দলে শহরে ছুটে আসে, তাদের একজন তিস্তা নদীর পারের এক গৃহবধূ । কিন্তু শহরে এসেও তারা কোনো প্রকার সাহায্য সহযোগিতা পায় না। দুর্ভিক্ষে পতিত লোকজন শহরে এসে খাদ্যের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকে। আকালের সুযোগ নিয়ে এসময় শহরের এক শ্রেণির জোতদার-মহাজন অর্থের বিনিময়ে ভাসমান ক্ষুধার্ত যুবতীদের সঙ্গ লাভ করে। শহরে ভুখাদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধলে গ্রাম থেকে আগত সেই নারী ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মহাজন নেকবর মিয়ার হোটেলে আশ্রয় নেয়। রাতে হোটেলে অবস্থানকালে এই নারী হোটেল মালিকের লালসার শিকার হয়। মধ্যরাতে ঘুম ভাঙলে সে এক হিংস্র পশুকে মোকাবেলা করে। নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে নেকবর মিয়ার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় তাকে খামচে ধরে। সে নিজের সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্য প্রচণ্ডভাবে জেগে ওঠে। সব শক্তি নিয়ে আঘাত করে নেশাখোর উন্মত্ত মহাজনকে। মহাজনের যৌন লালসা থেকে সাহসী এই মহিলা নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে সক্ষম হয়। মহাজনের আদিম হিংস্র ক্ষুধার শিকার হয়ে হাতে, ঠোঁটে, বুকে সমস্ত শরীর জুড়ে তাজা রক্ত নিয়ে বেরিয়ে আসে। এই সাহসী নারী অগ্নিমূর্তি ধারণ করে মহাজনকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে :

> তিস্তাপাড়ের মেয়ে মানুষ তখন জানোয়ারটার টুটি কামড়ে ধরেছে। দাঁত বসিয়ে দিয়ে ডাইনে-বায়ে ঝাঁকুনি দিচ্ছে মাংস ছিঁড়ে আনার জন্যে। আর জানোয়ারটা তখন ভয়ার্ত স্বরে চিৎকার আরম্ভ করে দিয়েছে, ছাড়, লাগে, উহ্ বাঁচাও-মাইরা ফালাইলো-বাঁচাও।

হোটেলের বাবুর্চি আর কর্মচারীরা দরজা ভেঙে মহাজনকে উদ্ধার করে। অসহায় নারীকে আশ্রয় দিয়ে মহাজন নিজের লালসাকে সংযত করতে পারেনি। তাই নিঃস্ব মহিলা পাল্টা আক্রমণে সমগ্রসত্তা নিয়ে রুখে দাঁড়ায়।

(চ) মহাজনের শোষণের বিরুদ্ধে আদিবাসী নিম্নবর্গের দ্রোহের আখ্যান

শওকত আলী রচিত 'কপিলদাস মুর্মূর শেষ কাজ' গল্পে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ধূর্ত ভূমিখোর মহাজন শ্রেণির দ্বন্দ্বের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকে তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে মহাজন সেখানে ট্রাক্টর দিয়ে চাষাবাদ করার পরিকল্পনা করে। এ খবরে বস্তিবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক

বিরাজ করলেও বৃদ্ধ কপিল দাসের মধ্যে জেগে ওঠে প্রতিরোধের বাসনা : 'মহাজন বসত উঠায় দিবা চাহিলেই কি হোবে, ক্যানে হামার কমরত্ জোর নাই।' কপিলদাস ফিরে যায় তার শৈশবের স্মৃতিতে–কীভাবে তীরের আঘাতে বাঘ হত্যা করেছিল। উত্তরসূরিদের মধ্যে তীর-ধনুক দিয়ে বনের জানোয়ার পরাভূত করার তালিম দিয়ে সে যেন আসন্ন শ্রেণিশত্রু মহাজনদের প্রতিরোধের দীক্ষা দিচ্ছে। সাঁওতালরা এক সময় তীর-ধনুক দিয়ে জঙ্গলের পশুদের পরাস্ত করে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল ও বসতি গড়ে তুলেছিল। সে বসতি থেকে মহাজন উচ্ছেদ করতে এলে অস্ত্র দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। মহাজনদের মতো অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার দৃঢ় প্রত্যক্ষ ব্যক্ত করে কপিলদাস। সাহসী কপিলদাস শোষণের বিরুদ্ধে সবাইকে সাহস জুগিয়েছে। শত্রুর বিরুদ্ধে আদিবাসী জনগণের মধ্যে বিপ্লবীচেতনা সঞ্চার করেছে। মহাজন শ্রেণির আধিপত্যকামী মানসিকতা ও ভূমি দখলের বিরুদ্ধে আদিবাসী নৃগোষ্ঠীর জেগে ওঠার আখ্যান 'কপিলদাস মুর্মূর শেষ কাজ'। গল্পের শেষে কপিলদাসের কাঁপা কাঁপা হাতে তীর ছোঁড়ার মধ্য দিয়ে সাঁওতাল জাতির সংগ্রামী ঐতিহ্য ও বীরত্বের চিহ্ন ফুটে উঠেছে :

> কপিলদাস বুড়ো দুহাতে তীর ধনুক নিয়ে সামনের অন্ধকারের দিকে চলতে থাকে। বিমূঢ় মানুষ জনের চোখের সামনে দিয়েই সে অনায়াসে অন্ধকার, গাছপালা কৈশোর এবং আদিম উল্লাসের মধ্যে চলে যায়। আর সেখানে থেকে সে তার তৃতীয় তীরটা সঠিক নিশানায় ছুড়বার জন্য তৈরি হতে থাকে।

শওকত আলী রচিত 'শুন হে লখিন্দর' গল্পে মনসামঙ্গলের লোক-পুরাণের আড়ালে মহাজন ও নিম্নবর্গের শোষণ-বঞ্চনা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে সাঁওতাল গুপীনাথ নিম্নবর্গের প্রতীকী চরিত্র। নিম্নবর্গের দেবী মনসা যেমন উচ্চবর্গের কাছে অবহেলিত ও উপেক্ষিত ছিল, তেমনি গুপীনাথরাও ছিল সমাজে শোষিত, নির্যাতিত ও উপেক্ষিত। অপরদিকে মহাজন লক্ষীকান্ত যেন সুরক্ষিত লখিন্দর। যুগযুগ ধরে বঞ্চিত আদিবাসী সাঁওতালদের জমানো ক্ষোভ যেন গুপীনাথের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে:

> হ্যাঁ, হিসাব ত মিটাবি-তুই বড়া সদাগর, তোর বহুত পাইসা, হামি জানি, চান্দো সদাগরের গুষ্টি না তুই? হিসাব মিটাবা পারিস তুই– কিন্তুক হিসাবটা তো বাবুমসয় বহুত লাম্বা। কত কালের হিসাব, কেহ জানে না- তুইও জানিস না।

মহাজনের কাছে পাওনা অর্থ পেতে গুপীনাথ মরিয়া হয়ে ওঠে। তার আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গির কাছে নিরুপায় মহাজন হার মানে, দ্রোহীরূপে ভীত হয়ে পড়ে। গল্পে শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব রূপায়ণে লেখক যুগ যুগ ধরে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর নিপীড়িত জীবনবাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। 'মনসামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত চাঁদ সদাগরের কাহিনী এবং বেহুলা-লখিন্দরের লোকমিথের অনুষঙ্গে বিন্যস্ত হয়েছে আদিবাসী সাঁওতাল জীবনের শোষণ ও বঞ্চনার কাহিনী।'[১৫]

শওকত আলীর গল্পের শেষভাগে লড়াকু নিম্নবর্গ বিজয়ী হয়, তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে তবে তা কখনও এককভাবে কখনো সম্মিলিতভাবে। প্রায় প্রতিটি গল্পে একই চিত্র লক্ষ করা যায়। প্রত্যেকটি গল্পেরই কেন্দ্রীয় চরিত্র মহাজন বা জোতদার শ্রেণি। তাদের অন্যায় নিষ্পেষণের শিকার হয়েছে দরিদ্র শ্রেণি। তবে নিম্নবর্গ নীরবে অন্যায় মেনে নেয় না। তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। গঞ্জামীণ জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় দিকগুলো সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যাপক ছিল বলেই হয়ত তিনি তাদের জীবনাচরণের নানাদিক বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। 'গ্রামজীবনের উপস্থাপনায়

হাসান আজিজুল হক, শওকত আলী, মঞ্জু সরকার, হরিপদ দত্ত, মুস্তাফা পান্না, সুশান্ত মজুমদার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই শ্রেণি সচেতনতাকে আশ্রয় করে নিরন্ন-নির্যাতিত মানুষের বিপক্ষে গ্রামীণ মহাজন ও টাউট রাজনীতির বিচিত্র দুর্বিপাককে তুলে ধরেছেন।'[১৬] শওকত আলীর সাহিত্যে সাধারণ মানুষের জীবনালেখ্য অঙ্কন প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> শওকত আলীর কথাসাহিত্যের প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে নিম্নবর্গের মানুষ, তাদের শোষিত জীবনের কথকতা। শওকত আলীর বিদ্রোহ সামন্ত ও সামন্ত অর্থনীতিপুষ্ট পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে। খুব কাছ থেকেই তিনি অন্ত্যজ শ্রেণিকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন। তাদের দুঃখ-বেদনা, হাহাকার, বঞ্চনার সঙ্গে একাত্ম হতে পেয়েছেন। তাঁর গল্পের নিপীড়িত মানুষ তাই প্রতিরোধের আগুনে খাঁটি, তারা দাঁড়িয়ে থাকে সত্যের মুখোমুখি।[১৭]

শওকত আলীর গল্পে স্পষ্টত দুটো পক্ষ পাওয়া যায়। একপক্ষে মহাজন, চৌধুরী, জোতদার, মণ্ডল অন্যপক্ষে নিম্নবর্গের দিনমজুর, বর্গাচাষী, কৃষক, সাপুড়ে। নিম্নবর্গের মানুষগুলো উচ্চবর্গের জুলুম, অন্যায়, শোষণ অত্যাচারে সব সময় সরাসরি প্রতিশোধ নিতে পারে না। কাজেই যখন প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব হয় না তখন তারা কৌশলে প্রতিরোধ করার পরিকল্পনা করে থাকে। নিম্নবর্গ বিনা প্রতিবাদে কোনো অন্যায় মেনে নেয় না। এই চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য তাঁর গল্পে ফুটে উঠেছে। 'শওকত আলী শ্রেণি-সচেতন শিল্পী, তাই বস্তুবাদী সমাজচিন্তার আলোকে তিনি তুলে ধরেন গ্রামীণ মহাজনশ্রেণির শোষণের চিত্র, নিমার্ণ করেন সর্বহারা মানুষের সংগ্রাম ও উত্তরণের জয়গাথা।'[১৮] তাঁর গল্প বিশ্লেষণে বলা যায়, তিনি মহাজন-জোতদারদের দেখেছেন গ্রামীণ সমাজে পুঁজিপতি হিসেবে। আর তারা পুঁজি সংগ্রহের জন্য নানা অপকৌশল– শোষণ, লুণ্ঠন, জবরদস্তি ও প্রতারণা প্রভৃতি পথ বেছে নেয়। শ্রমজীবীদের শ্রম, সম্পদ সবই তিলে তিলে নিয়ে নিঃস্ব করে নিজেরা ধনবান হয়। 'বাংলাদেশের সমাজবিন্যাস, শ্রেণিসংগঠন ও শ্রেণিসংগ্রামের আদি বৈশিষ্ট্যের দ্বন্দ্ব-জটিল স্বরূপ অনুধাবন শওকত আলীর সমাজ – অধ্যয়নের ঐকান্তিকতার পরিচয়বাহী।'[১৯] শওকত আলী মৃত্তিকামূলস্পর্শী জীবনের কথাসাহিত্যিক। গ্রাম-বাংলার শোষিত-নির্যাতিত-বিপন্ন মানুষের জীবনের ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে আন্দোলিত করেছে। এ প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> গল্পগুলো লেখার সময় মার্কস-এঙ্গেলসের পুঁজিবাদী ধারণা প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল শওকত আলীর লেখক সত্তায়। পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। যে কারণে, তার চরিত্র মহাজনেরগোলার ধানচুরিকেও অপরাধ বলে বিবেচনা করে না ।[২০]

উত্তরবঙ্গের রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের গ্রামীণ জোতদার, মহাজন, ভূস্বামী ও সামন্তপ্রভুদের সমবেত শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত-বঞ্চিত নিম্নবগের্র প্রতিবাদ-প্রতিরোধ তাঁর গল্পে শিল্পমণ্ডিত হয়েছে। তাই তাঁর গল্পকে আঞ্চলিক জীবনের আখ্যান হিসেবে দেখা হয়। 'শওকত আলীর গল্পের বৃহৎ অংশের পটভূমি বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের গ্রামজীবন। গ্রামীণ সংঘ-জীবনের ভাঙা-গড়ার দ্বন্দ্বে আলোড়িত ও আন্দোলিত তাঁর ছোটগল্পের চরিত্ররা।'[২১] তিনি গল্পে শোষকশ্রেণির মুখোশ উন্মোচন করেছেন। গ্রামীণ জীবনের বৈচিত্র্যময় ঘটনাসমূহ হাসান আজিজুল হকের গল্পে শিল্পমণ্ডিত হয়েছে। তিনি গ্রামের মহাজন ও নিম্নবর্গের দ্বন্দ্বের পাশাপাশি দেশ-বিভাগ, দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে গল্প লিখেছেন। গ্রামীণ পটভূমিতে সৈয়দ শামসুল হকও অনেক শিল্পসফল গল্প লিখেছেন। তিনি গ্রামের মানুষের জীবনাচরণে সমকালীন রাজনীতির প্রভাব ফুটিয়ে তুলেছেন। নিম্নবর্গের সঙ্গে মহাজন শ্রেণির ঐতিহাসিক লড়াই যেমন তেভাগা আন্দোলন, আধিয়ার আন্দোলন ও সাঁওতাল বিদ্রোহ শওকত

আলীকে নাড়া দিয়েছিল বলেই গল্পের পটভূমিতে এ প্রসঙ্গগুলো বার বার এসেছে। তিনি অসম সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন প্রত্যাশা করেন। তাঁর গল্পের পটভূমিতে আছে নিম্নবর্গের ইতিহাস। তিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মহাজন ও নিম্নবর্গের দ্বন্দ্বের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। ফলে শওকত আলীর গল্প পাঠের মাধ্যমে তৃণমূল কৃষকশ্রেণির প্রতিরোধ-উদ্যোগ সম্পর্কে জানা যায়। গল্পে একদিকে আছে কৃষকদের প্রতিবাদ কৌশল অন্যদিকে তাদের অধীনতার স্বরূপ। কৃষক বিদ্রোহকে তিনি নতুনভাবে তাঁর গল্পে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নবর্গ সবসময় শাসকগোষ্ঠীর অধীনে থাকে এমনকি বিদ্রোহ ও জেগে ওঠার মুহূর্তেও তারা শাসকবর্গের কর্মকাণ্ডের অধীন। শওকত আলী নিম্নবর্গের এই চেতনার জগৎটাকে উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। 'নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদেরা নিম্নবর্গকে নীচ থেকে দেখেন না, ওপর থেকে দেখার তো প্রশ্নই ওঠে না, দেখতে চান ভেতর থেকে। তাঁরা খুঁজতে ও বুঝতে চান নিম্নবর্গের মানুষের চেতনার জগৎ।'[২২] মহাজনের প্রতি আনুগত্য ও বিরোধিতার সমন্বয় নিম্নবর্গের চেতনায় লক্ষ করা যায়। তাদের প্রতিরোধচেতনা তৈরি হয়, কিন্তু প্রবলভাবে তারা বিপ্লব করতে পারে না। এখানে ভূস্বামীরা স্বার্থের ব্যাপারে থাকে সক্রিয়, অপরদিকে নিম্নবর্গ অনেকটাই থাকে নির্জীব। 'শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রভূত্বের অধিকারী উচ্চবর্গের চেতনা মৌলিক, সমগ্র, সক্রিয়। অন্য দিকে নিম্নবর্গের চেতনা খণ্ডিত, নির্জীব, পরাধীন।'[২৩] গ্রামের কৃষিজীবী বিত্তহীন মানুষের জীবন-যাপন, মহাজনের শোষণ, অর্থনৈতিক মন্দা, মঙ্গা, খড়া, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির পরিচয় তাঁর গল্পে পাওয়া যায়। প্রান্তিক অস্তিত্বসর্বস্ব মানুষের সংকট, সামন্তশ্রেণির মহাজন ও জোতদারের উপর্যুপরি নির্যাতন-নিপীড়নে দিশেহারা তৃণমূল মানুষের টিকে থাকার গল্প তিনি লিখেছেন। তাঁর গল্পে মহাজন ও নিম্নবর্গের সম্পর্কসূত্র প্রসঙ্গে বলা যায়, 'প্রভূত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক, বৈপরীত্যের দ্ব্যণুক সম্পর্ক।'[২৪] একই সঙ্গে তাঁর গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণির মর্মবেদনার রূপায়ণ ঘটেছে। তাঁর গ্রামীণ পটভূমিতে লেখা গল্পে নিম্নবর্গের ঘুরে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র হলেও তাদের মনোভাব প্রতিরোধ-প্রতিশোধের। সামাজিক দায়বোধ থেকে শওকত আলী তাঁর গল্পের অন্তর্ভুবনে মহাজন ও সর্বহারাদের দ্বান্দ্বিক জীবনচিত্র তুলে এনেছেন। নিম্নবর্গের শোষিত মানুষের প্রতি তাঁর ছিল গভীর সহানুভূতি, তিনি সাধারণ নিপীড়িত শ্রেণির মুক্তি প্রত্যাশা করেছেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. শাফিক আফতাব, *শওকত আলীর উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের জনজীবন* (ঢাকা : গণপ্রকাশনী, ২০১৮), পৃ. ২২

২. সিরাজ সালেকীন, 'গল্পের মানুষ', *গল্পকথা*, চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত, শওকত আলী সংখ্যা, বর্ষ ৬, রাজশাহী, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩৯০

৩. শওকত আলী, 'নবজাতক', *গল্পসমগ্র* (ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১৬), পৃ. ১৮১ [আলোচ্য প্রবন্ধে গল্পের মূলপাঠ উক্ত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।]

৪. চঞ্চল কুমার বোস, *শওকত আলীর কথাসাহিত্য জীবন ও সময়ের বিনির্মাণ* (ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১৫), পৃ. ১৪৭-১৪৮

৫. সরিফা সালোয়া ডিনা, *হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প বিষয় ও প্রকরণ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১০), পৃ. ৩৫

৬. চঞ্চল কুমার বোস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৭. চঞ্চল কুমার বোস, *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৯), পৃ. ২৬২

৮. চঞ্চল কুমার বোস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

৯. তদেব, পৃ. ১৫৮

১০. তদেব, পৃ. ১৫০

১১. তদেব, পৃ. ১৫৭

১২. সিরাজ সালেকীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪

১৩. চঞ্চল কুমার বোস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩

১৪. চন্দন আনোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩

১৫. চঞ্চল কুমার বোস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

১৬. সিরাজুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের ছোটগল্প', *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য*, সাঈদ-উর রহমান সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ৯২-৯৩

১৭. খোরশেদ আলম, 'বাবা আপনে যান: নিপীড়িতের যাপন-যন্ত্রণা', *গল্পকথা* , প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২

১৮. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য* (ঢাকা : আজকাল প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ১৮৩

১৯. রফিকউল্লাহ খান, বাংলা*দেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ২৯২

২০. চন্দন আনোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩

২১. রাহেল রাজিব, *শওকত আলীর ছোটগল্প বিষয় উন্মোচন ও ভাষার অন্তর্দেশ* (ঢাকা : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭), পৃ. ২১

২২. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'ঔপনিবেশিক ভারতে ইতিহাসের গতিবিধি', *নতুন দিগন্ত*, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত, ঢাকা : ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৪), পৃ. ২৯

২৩. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকা : 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস', *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, গৌতম ভদ্র (সম্পাদিত) (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৯৯), পৃ. ৪

২৪. রণজিৎ গুহ, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' , *নিম্নবর্গের ইতিহাস* , পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮